খেয়াল বা খ্যাল ঃ খেয়ালে রাগের বাঁধন থাকলেও ধ্রুপদের মত রাগ বিস্তারের ধরা বাঁধা নিয়ম সে মেনে চলে না। খেয়াল হল দুরন্ত, দুর্বার, তরলতাই হল ওর ধর্ম ; ও উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু প্রাণোচ্ছল। কখনো সুরের পাখনা মেলে অসীম

আকাশে উড়ে চলে, কখনো পাখনার তান ঝাপটায় ওর দাপট দেখা যায়, কখনো চঞ্চল, কখনো স্থির, কিন্তু ধীর নয়, ধ্রুপদের মত গম্ভীর, শান্ত সমাহিত মূর্তি নয় তবে স্থির লক্ষ্যে রাগকে স্বীকার করে নানা ছন্দে রস সৃষ্টি করে চলে।

খ্যাল শব্দটি আরবি শব্দ, * অর্থ কল্পনা, বিচার বা ধ্যান। রাগের ধ্যান মূর্তি কল্পনা করে তাকে বিচার পূর্বক বিস্তারিত প্রকাশ করার নামই খ্যাল। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ খ্যাল মানে যথেচ্ছাচার বোঝেন সেটি ঠিক নয়।

মুঘল দরবারের ইতিহাসের পাতা থেকে ও সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে আমির খুসরোকেই এর প্রচলন কর্তা বলে জানতে পারি। পরবর্তীকালের প্রচারক হিসাবে নাম পাই সুলতান হুসেন সর্কীর। সম্রাট সাজাহানের (১৬২৮-৬৬) দরবারে এই দুই পদ্ধতিই চালু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে আকবর বাদশার আমলেও (১৫৪২-১৬০৫) খেয়ালের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন খেয়ালীও সে দরবারে ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ খেয়াল গাইতেন। আকবরের দরবারে খেয়ালীরা বিশেষ নাম করতে না পারলেও সেখান থেকেই খেয়াল স্টাইল রূপ বদলে সাজাহানের দরবারে এসে আসর জমায়। ধ্রুপদের সময়ে খেয়াল গান প্রচলিত থাকলেও কোন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাসরে খেয়ালীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত না। এতং সত্ত্বেও উপেক্ষা ও অবহেলার মাঝে খেয়াল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে তার মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তার সৌকুমার্যের ও লালিত্যের বৈশিষ্ট্যে। ঔরংজেবের সময় থেকেই খেয়াল বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্রাটের ছেলেরা বা নাতিরা গান শিখতেন এরকম নজীরও পাওয়া যায়। সঙ্গীত-গুণী সদারঙ্গই প্রথমে তৎকালীন চলতি বিভিন্ন ঢং-এর সমন্বয়ে এক বিশেষ চালের খ্যাল প্রবর্তন করেন। আমীর খুসরো বা হুসেন সর্কীর খ্যালের বিশেষ বিশেষ কায়দা যদিও কোন কোন ঘরে প্রয়োগ করা হত, তবুও সদারঙ্গ-এর খেয়ালকে অনুসরণ করেই বিশেষ ভাবে এক খ্যালি রীতি গড়ে উঠেছিল ও সাধারণের কাছে সেই কায়দাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। বিখ্যাত বীণকার নিয়ামৎ খাঁরই ছদ্ম নাম ছিল সদারঙ্গ, এই ছদ্ম নামেই তিনি বহু খ্যাল গান রচনা করে যান। খ্যালে এঁর সময় থেকেই বীণের জোড় ও বাণীর উপর জোর দিয়ে স্বর বিস্তারের সাহায্যে বোলতান যুক্ত হয়। ধ্রুপদের বাণীর মত খেয়ালেও নানা বাণী প্রচলিত হল যেগুলি রাগভাব,

ভাষা ও তালের কায়দার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সদারঙ্গ-এর খেয়াল দুই তুক বিশিষ্ট ছিল। প্রথম হল স্থায়ী অঙ্গ ও দ্বিতীয় অন্তরা—এই অন্তরা ধ্রুপদের আভোগের কায়দায় রচিত হত এবং অন্তরায় গীত রচয়িতার নাম থাকত। আস্থায়ী অন্তরা গাইবার পর প্রথমে স্থায়ীর ও পরে অন্তরার বিস্তার করা হত। বিস্তারে গানের কোন একটি পদ অথবা আকারের ব্যবহার করা হত ও নানা অলংকার এবং গমকের ব্যবহারও থাকতো। গানের ভঙ্গী তার ভাষা ও ভাবের উপর নির্ভর করেই বিস্তার করা হত এবং সবশেষে দ্রুত গতিতে নানা ছন্দ ও অলংকার প্রকাশ করা হত। আজকে এই ধরণ সম্পূর্ণ বর্তমান নাই, এখন বোলতান, আকার যোগের তান, নানা ধরণের তেহাই, গমক, অতি দ্রুত তান ও সরগম ব্যবহার করা হয়।

খেয়ালের ভাষায় পূরব কি হিন্দি, ব্রজভাষা, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষা এবং খড়ি বোলি অর্থে উর্দ্দু ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ব্রজবুলিতে ভাষার আধিক্যই বেশী, ভাষার বিষয়বস্তুর মধ্যে নায়কের প্রশংসা, নায়িকাভেদ, প্রেম-কাহিনী ও প্রকৃতির বর্ণনা প্রভৃতি থাকে। এ ছাড়া প্রার্থনার বাণী, নাদ ও রাগের ধ্যানাদির বর্ণনাও দেখা যায়। খেয়ালের তালে তিনতাল, একতাল, ঝুমরা, পাঞ্জাবীঠেকা, নানা ধরণের সওয়ারী এবং ঝাঁপতাল, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালের প্রচলন দেখা যায়। যে সব রাগ গম্ভীর ওজঃযুক্ত অর্থাৎ যাতে Incitement আছে, বিস্তারের বেশী সুবিধা আছে বিদারী বা অপন্যাসের বহুল প্রয়োগ সম্ভব, সেই সব রাগই খেয়ালের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। চটুল চপল জাতীয় ক্ষুদ্র রাগেরা খেয়ালের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়।